কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৬ ...

হারুন-অর-রশিদ

# বিজ্ঞান শিক্ষার বেহাল

বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করলে, নিম্ন মধ্যম আয়ের এই দেশে বেশির ভাগ মানুষই পড়াশোনা শেষে সম্মানজনক কোনো পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পথে হাঁটলে কঠোর পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন পাওয়া যাবে? কর্মজীবনে গবেষণার সুযোগই বা কতটুকু?

বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব যখন বিজ্ঞানের কল্যাণে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, বাংলাদেশে তখন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস (ব্যানবেইস)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ৪২.৮১ শতাংশ। ২০০০ সালে ছিল ২৯.৪৭ শতাংশ, ২০১০ সালে ২২.৩৫ শতাংশ আর ২০১৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী দাঁড়িয়েছে ২৫.০১ শতাংশে। অর্থাৎ ২৫ বছরের ব্যবধানে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১৭.৮০ শতাংশ। একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও। ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ২৮.১৩ শতাংশ। ২০০০ সালে ছিল ২২.৮৩ শতাংশ; ২০১০ সালে ১৮.৩৫ শতাংশ আর ২০১৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী দাঁড়িয়েছে ১৭.০৩ শতাংশে। অর্থাৎ ২৫ বছরের ব্যবধানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১১.১০ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান হচ্ছে, ১৯৯০ সালে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ১৭ শতাংশ আর ২০১৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা যেমন কমেছে, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে উচ্চতর পর্যায়েও এই সংখ্যা তেমনি আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানাগার ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভিত্তি দুর্বল থেকে যাচ্ছে। মুখস্থ বিদ্যার ওপর ভর করে তারা এসএসসি পার হলেও কলেজ পর্যায়ে এসে সমস্যায় পড়ছে। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষার্থী বিভাগ পরিবর্তন করে মানবিক বা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় চলে যাচ্ছে। নিম্নমুখী এই অব্যাহত প্রবণতা গ্রামের স্কুল-কলেজগুলোতে বেশি প্রকট। কিছু অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া শহরেও চিত্রও অভিন্ন। দক্ষ শিক্ষক আর উপযুক্ত বিজ্ঞানাগারের প্রয়োজনীয়তা সহজেই উপলব্ধি করা যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি থেকে—'সপ্তাহে একদিন রবিবার সীতানাথ দত্ত (ঘোষ) মহাশয় আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।...যে রবিবার সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বলিয়াই মনে হইত না।'

ইউনেসকোর সুপারিশ অনুযায়ী, শিক্ষা খাতে একটি দেশের বরাদ্দ হওয়া উচিত নিজ দেশের জিডিপির ৬ শতাংশ অথবা বাজেটের ২০ শতাংশ। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৩.১০ শতাংশ থেকে কমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১.৬০ শতাংশ হয়। জিডিপির অনুপাতে বর্তমান অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশ, আগের অর্থবছরে যা ছিল ২.১৬ শতাংশ। আমাদের শিক্ষা খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, ২২ শতাংশ। তার পর থেকে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে কমতে শুরু করে, যেখানে সারা বিশ্বে শিক্ষা বাজেট বাড়ছে। অথচ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল। কারণ বিজ্ঞান শিক্ষাই দেশকে পশ্চাৎপদতা থেকে মুক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মনে রাখতে হবে, জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের সুফল আসে ধীরে ধীরে, কিন্তু এ সুফল সুনিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ী। অর্থনীতিবিদদের মতে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক এবং নিরাপদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। বাস্তবতার নিরিখে বিবেচনা করলে, নিম্ন মধ্যম আয়ের এই দেশে বেশির ভাগ মানুষই পড়াশোনা শেষে সম্মানজনক কোনো পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে চায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পথে হাঁটলে কঠোর পরিশ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন পাওয়া যাবে? এ দেশে প্রথম শ্রেণির সম্মানজনক আকর্ষণীয় সরকারি চাকরি বা বহুজাতিক কম্পানি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কোনো লোভনীয় চাকরিতে মৌলিক বিজ্ঞানের কতটুকু প্রয়োগ আছে? কর্মজীবনে গবেষণার সুযোগই বা কতটুকু? বাস্তবিকই আমাদের দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক পড়ালেখার সঙ্গে কর্মজীবনের মিল সামান্যই, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানভিত্তিক চাকরির ক্ষেত্রও খুব কম। ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক পড়ালেখার প্রতি শিক্ষার্থীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের উচিত বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্টির নিমিত্তে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টির নেশা তৈরি করতে সম্ভাব্য সব কিছু করা।

লেখক : শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
h_o rashid@yahoo.com